ডিজিটাল ডিভাইস কি আমাদের মস্তিষ্ক পাল্টে দিচ্ছে?

মোঃ সা'দাদ রহমান

কেউ কেউ বলেন ডিজিটাল ডিভাইস ও কমপিউটার আমাদের বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে সহায়তা করে কিংবা এগুলো আমাদের জন্য উপকারী। এগুলো আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু সক্ষমতা বাড়ায়, যেমন রিঅ্যাকশন টাইম। সম্ভবত তা কিছুটা হলেও সত্য, তবে সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, এই উপকারটা খুবই সীমিত।

সংক্ষেপে বললে বলতে হয়– গবেষণায় দেখা গেছে, অব্যাহতভাবে আমাদের মনোযোগ ভিন্নমুখী করে ইন্টারনেট আমাদের বোধজ্ঞানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তবে তা আমাদের মস্তিষ্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে না।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, যদিও ভিডিও গেম ও মস্তিষ্কের প্রশিক্ষণ প্রভাব পেলে যথাক্রমে আমাদের আগ্রাসন ও বোধশক্তির ওপর, এই প্রভাবের পরিসর আমাদের ভাবনার তুলনায় অনেক কম।

ডিজিটাল ডিভাইসের ঝুঁকি কমিয়ে আনা যেতে পারে মানুষকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলে- যাতে মনোযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জটিল চিন্তার দক্ষতা জোরদার করে তোলা যায়।

দশ বছর আগে প্রযুক্তিবিষয়ক লেখক Nicholas Carr আটলান্টিক পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশ করেন। লেখাটির শিরোনাম ছিল- Is Google Making Us Stupid? লেখাটিতে তিনি এর 'হ্যাঁ' জবাবটিই সমর্থন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে আমাদের মস্তিষ্ক পরিবর্তন করে চলেছে। এটি ছিল ইন্টারনেটের ও ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন ডিভাইস অর্থাৎ সেলফোন, ট্যাবলেট, গেম কন্সোল ও ল্যাপটপের বিরুদ্ধে একটি বিরূপতা। কখনো কখনো একই অভিযোগ তোলা হয় সেইসব ভিডিও গেমের বিরুদ্ধে, যেগুলোতে রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ। দাবি করা হয়, এগুলো খেলোয়াড়দের সন্ত্রাসী করে তোলে। কিন্তু, ডিজিটাল ডিভাইসের পক্ষে রয়েছে এর প্রবল সমর্থকও। বিশেষত, ব্রেন-ট্রেনিং গেমের প্রমোটরেরা এই সমর্থকদের অন্যতম। এদের দাবি, ডিজিটাল ডিভাইস আমাদের মনোযোগ, স্মৃতি ও স্নায়ুবিক উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- কাদের দাবি সঠিক?

এর সোজাসাপ্টা কোনো জবাব নেই। বিবেচনায় আনুন Nicholas Carr-এর অভিযোগ। তিনি উদ্ধৃত করেছেন স্নায়ুবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলের কথা। তারা দেখিয়েছেন, মস্তিষ্ক আমাদের আগে জানা বোঝার তুলনায় অনেক বেশি প্লাস্টিক। অন্য কথায়, সময়ের সাথে মস্তিষ্কের সক্ষমতা রয়েছে একে রি-প্রোগ্রাম করার, এটি হতে পারে মস্তিষ্কের ওপর ইন্টারনেটের প্রভাবে। এরপরও ২০১০ সালে 'লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি অভিমতমূলক লেখায় তৎকালীন ইউনিয়ন কলেজের মনস্তত্ত্ববিদ ক্রিস্টোফার চেব্রিস এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল চে সিমসন আরবান-ক্যাম্পেইনে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে কারের অভিমতকে খণ্ডন করেন। তারা বলেন- 'শুধু পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য প্রমাণেই দেখানো হয়নি যে, নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে বসবাস মৌলিকভাবে মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন আনে, সেই সাথে এটি মস্তিষ্কের আলোকপাত করার ক্ষমতার ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে।'

আমরা 'স্টুপিড' হয়ে যাচ্ছি, এ ধারণা আসে কোথা থেকে? এটি অংশত আসে সে জ্ঞান থেকে, যে ডিজিটাল ডিভাইস দখল করে নিচ্ছে আমাদের মনোযোগ। একজন বন্ধুর কাছ থেকে আসা একটি ম্যাসেজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী অথবা একটি সাইটে একটি অনলাইন সেলস প্রমোশনের কাজ করে মানব মস্তিষ্কের মতোই। এগুলো আমাদের বার বার স্ক্রিনে হাজির করতে পারে বলে এর প্রতি আমরা মনোযোগী হয়েছি।

মানুষ কনস্ট্যান্ট আউটপুট নিয়ে বিস্মিত হয়। কিন্তু কিছু মানুষের বিশ্বাস, তারা মল্টিটাস্কার হয়ে উঠেছে- তারা ভাবে এরা এক আউন্স দক্ষতা না হারিয়ে অব্যাহতভাবে এমনকি ড্রাইভিংয়ের সময়েও কাজে ও টুইটারে একই সাথে কাজ করতে পারছে। কিন্তু একটি গবেষণা কমিটি নিশ্চিত করেছে, এই ছাপ হচ্ছে একটি বিভ্রম মাত্র। যখন কোনো ব্যক্তি একসাথে একাধিক এমন কিছু করতে চেষ্টা করে, যা করতে মনোযোগের প্রয়োজন হয়, তখন কর্মসফলতায় ঘাটতি দেখা দেয়। অধিকন্তু ২০১৩ সালে তৎকালের ফ্রান্সের মার্সেলি ইউনিভার্সিটির স্টিফেন অ্যামেতো ও তার সহকর্মী দেখান, ওয়েবপেজ সার্ফিং মানুষকে এক ধরনের পক্ষপাতিত্বে সহজগ্রাহী করে তোলে, যার নাম প্রাইমেস ইমপেক্ট- এরা তাদের দেখা প্রথম কয়েকটি ইনফরমেশনকে পরবর্তী অবশিষ্ট্য ইনফরমেশন থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ মাল্টিটাস্কের উন্নয়ন ঘটায় না। ২০০৯ সালে তৎকালীন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইয়েল ওফির এবং তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন- ইন্টারনেটে মাল্টিটাস্কিং প্যারাডক্সিক্যালি (যে উক্তি আপাতত স্ববিরোধী মনে হলেও সত্যবিবর্জিত নয়) ইউজারদের এক কাজ থেকে আরেক কাজে যাওয়ার ব্যাপারে কম সক্ষম করে ফেলে। এরা তাদের মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে কম সক্ষম, যার ফলে কাজে ধ্বংস টেনে আনতে পারে। পরিণামে, এমনকি 'ডিজিটাল নেটিভ' জেনারেশনের সদস্যরাও তাদের বিভিন্ন কাজের সময় বিভাজনের ওপর সহজাত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। অন্য কথায়, ডিজিটাল মাল্টিটাস্কিং যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বিভ্রমের জন্ম দিতে পারে।

সুখবরটি হচ্ছে, আপনার মনোযোগের পরিধি সংরক্ষণ করতে আপনার ব্রেন রি-রাইট করার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেকে সহায়তা করতে পারেন যেসব বিষয় আপনার মনোযোগকে ভিন্নপথে ধাবিত করে সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং সে মনোযোগ হারানোর সংক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানের কৌশল উদ্ভাবন করে। আপনাকে অনুশীলন করতে হবে কিছু সেলফ-কন্ট্রোল বা আত্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল। ফেসবুক নেটিফিকেশন প্রতিরোধ করতে পারেন না? কাজের সময় এসব বন্ধ রাখুন। ভিডিও গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছেন? আপনার ডিভাইসকে নজরের বাইরে রাখুন, সহজেই যাতে তা হাতে না পেতে পারেন।

ভিডিও গেমস আমাদের আগ্রাসী করে তোলে- এই অভিযোগের জবাব কী? অনেক প্রতিবেদনে সমর্থন আছে এই অভিযোগের। ২০১৫ সালে অ্যামেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সমীক্ষাগুলোর একটি পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, ভায়োলেন্ট ভিডিও গেম খেলা আগ্রাসী চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও আচরণকে উসকে দেয়, এর ফলে ঘটনার শিকারের প্রতি সহমর্মিতা কমে যায়। এই উপসংহার আসে ল্যাবরেটরি রিসার্চ এবং অনলাইন গেম খেলোয়াড়দের ওপর নজরদারি থেকে। গেমারদের বেলায় যত বেশি ভিডিও গেম খেলা হয়, গেমার তত বেশি ভায়োলেন্ট হয়, তাদের আচরণও হয় তত বেশি আগ্রাসী।

গেমিং কি মস্তিষ্কের উন্নয়ন ঘটায়? এই সমীকরণের বেনিফিট সাইড হচ্ছে, বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দাবি করা হয়- ভিডিও গেম রিঅ্যাকশন টাইম, মনোযোগের পরিধি ও কাজের পরিধির উন্নয়ন ঘটায়। এক্ষেত্রে ডায়নামিক ও এঙ্গেইজিং অ্যাকশন গেমগুলো ইতিবাচক- অবরুদ্ধ পরিবেশে গেমারেরা দ্রুত রিঅ্যাক্ট করতে শিখে। নজর রাখে সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশনের ওপর এবং তা মনে রাখে। যেমন- ২০১৪ সালে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের কারা ব্ল্যাকার ও তার সহকর্মীদের পরিচালিত 'কল অব ডিউটি' সিরিজে গেমের ভিজ্যুয়াল মেমরি (শর্ট-টার্ম মেমরি) প্রভাবের সমীক্ষা তুলে ধরেন। এসব গেমে গেমারেরা সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষকেরা জানতে পারেন ৩০ ঘণ্টা গেম খেললে এই সক্ষমতা বাড়ে কজ